চিন্তন

গুরুসেবা ও তার ফল

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ

শাস্ত্রে বলা হয়েছে, তিনিই গুরু, যিনি 'গু' অর্থাৎ অন্ধকার, 'রু' অর্থাৎ তার (সেই অন্ধকারের) নিরোধক (নাশক)। অন্ধকারকে নিরোধ (নিবারণ) করেন বলে তাঁকে 'গুরু' বলা হয়। (গুরুগীতা ২০)। প্রণামমন্ত্রে বলা হয়েছে, অজ্ঞানতিমিরে যে-মানুষ অন্ধ হয়ে আছে, জ্ঞানের অঞ্জন-শলাকা দিয়ে তার চক্ষু যিনি উন্মীলিত করে দেন তিনিই গুরু (তদেব ২৭)। আমরা তো চোখ চেয়ে আছি! জগৎ জুড়ে আমরা তো দেখেই চলেছি নানান কিছু! তাহলে? আসলে গুরু আমাদের অজ্ঞানের জগৎ থেকে জ্ঞানের জগতে নিয়ে যান।

উপনিষদে প্রার্থনা করা হয়েছে, ''অসতো মা সদ্‌গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়'' (বৃহদারণ্যক, ১।৩।২৮)—অসৎ থেকে সতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে আমাকে পৌঁছে দাও। অসৎ অর্থাৎ যার আসলে অস্তিত্ব নেই। ব্যাবহারিক দিক থেকে অস্তিত্ব থাকলেও পারমার্থিক দিক থেকে যার অস্তিত্ব নেই, অতএব যার অস্তিত্ব নিত্য নয়। যা অনিত্য তা অসৎ আর যা নিত্য তা-ই সৎ—এটি বোঝার অর্থই জ্ঞান, না বোঝা অজ্ঞান। তাই অসৎকে নিয়ে যখন আমরা থাকি তখন অজ্ঞানে আবৃত থাকি। আর যখন অজ্ঞানে আবৃত, তখন আমরা মৃত্যুভয়ে আক্রান্ত। আমাদের দুশ্চিন্তা হয়, মনে হয় আমি অসুস্থ হব, মরে যাব!—এই চিন্তার মধ্যে আছে আমার শরীর-মন-প্রাণের প্রতি ভালবাসা। আমি ভাবছি আমার দেহ-মন-প্রাণ চিরস্থায়ী। একে মনে হয় নিত্যবস্তু, সৎবস্তু, নিত্য অস্তিত্বশীল বস্তু। আসলে তা নয়। এই শরীরটা ধ্বংস হয়ে যাবে। 'শরীরং ক্ষণবিধ্বংসি'—শরীর তো ক্ষণে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। 'শীর্যতে ইতি শরীরম্'—শীর্ণ হয়ে যায়, তাই তো 'শরীর'। কোনও না কোনও দিন তা মারা যাবে। তবু আমি মৃত্যুভয়ে ভীত হই, কারণ আমার জ্ঞান হয়নি। অজ্ঞানের ভেতর যে থাকে, সে আসলে এই অনস্তিত্বশীল, নশ্বর জগতকে নিয়ে মেতে আছে।

গুরু কী করবেন? গুরু এসে আমাকে সৎ-অসৎ চিনিয়ে দেবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ গল্পচ্ছলে খুব সুন্দরভাবে এটি ব্যাখ্যা করেছেন।[১] একজন গুরু তাঁর শিষ্যকে বোঝাচ্ছিলেন যে, সংসার তোমার আপনার নয়। তোমার মা-বাবা বা পরিবার-পরিজন—এরা আপনার কিন্তু ব্যাবহারিক দিক থেকে। পারমার্থিক দিক থেকে, সত্য অর্থে একমাত্র ভগবানই আপনার। এরা ক্ষণিক আপনার। গুরুর কথা শিষ্যের বিশ্বাস হচ্ছিল না। তখন গুরু

তাকে বললেন, ''আমি তোমায় দেখিয়ে দিচ্ছি, কেউ তোমার নয়। এই ঔষধবড়ি কয়টি তোমার কাছে রেখে দাও। তুমি বাড়িতে গিয়ে খেয়ে শুয়ে থেকো। লোকে মনে করবে যে তোমার দেহত্যাগ হয়ে গেছে। কিন্তু তোমার সব বাহ্যজ্ঞান থাকবে, তুমি দেখতে শুনতে সব পাবে;—আমি সেই সময় গিয়ে পড়ব।'' শিষ্যের আপাত-মৃত্যুর পর গুরু পৌঁছলেন। বাড়ির সবাই খুব কান্নাকাটি করছিল, গুরুদেব বললেন, ''আচ্ছা, এর ঔষধ আছে—আবার বেঁচে উঠবে। তবে একটা কথা আছে। এই ঔষধটি আগে একজন আপনার লোকের খেতে হবে, তারপর ওকে দেওয়া যাবে! যে আপনার লোক ওই বড়িটি খাবে, তার কিন্তু মৃত্যু হবে।'' ছেলের মা যিনি বৃদ্ধা হয়েছেন, কিছুদিন পর হয়তো এমনিতেই মারা যাবেন, তিনিও কিন্তু ওষুধ খেলেন না। তার স্ত্রীও খেলেন না। কেউই খেল না। কারণ সবার মৃত্যুভয় আছে। বোঝা গেল, পারমার্থিক দিক থেকে কেউ আপনার নয়। যদি কেউ জীবনে এই উপলব্ধি করতে পারে, তাহলেই এই নশ্বর জগতের প্রতি তার আসক্তি কমে আসে। গুরু আমাদের এটি শেখানোর জন্য আসেন। এই শিষ্যটির ক্ষেত্রে গুরু কী করেছিলেন? 'অসৎ' বা অনস্তিত্বশীল জগৎ নিয়ে তার যে-অজ্ঞানতা ছিল, তা তিনি দূর করে দিয়েছিলেন, যাতে মৃত্যুভয় থেকে সে বেরিয়ে আসতে পারে। এইজন্যই গুরুর কাছে আমরা যাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার আদর্শ : ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবই গুরু। সেই গুরুশক্তির পরম্পরা আমাদের পরমপূজ্য গুরুদের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে। সেই গুরুশক্তির প্রকাশের ফলে আমরা এই সংসারে অনিত্য, অসৎ বস্তুর মধ্যে থেকেও এই বোধের দিকে যেতে পারি যে—আমরা শরীর, মন বা প্রাণ নই; আমরা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত আত্মা। এইজন্যই গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন-ভজন করা হয়।

এখন প্রশ্ন, গুরু তুষ্ট হবেন কী করে? শাস্ত্রে বারবারই বলা হয়েছে, গুরুর সন্তুষ্টি শিষ্যের পক্ষে কল্যাণকর। আমরা জানি সেবার দ্বারাই ভগবান তুষ্ট হন। গুরু আর ইষ্ট স্বরূপত এক। সুতরাং গুরু বা ইষ্টকে আমরা সেবার দ্বারা তুষ্ট করতে পারি। গীতায় অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ সেবার কথা বলেছিলেন, ''তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।'' (গীতা ৪।৩৪) এই সেবা কীভাবে করব? সাধারণের ধারণা যে গুরুসেবা করতে গেলে কিছু পার্থিব জিনিস নিয়ে যেতে হবে। এখানে প্রশ্ন ওঠে, গুরু তো এই পৃথিবী থেকে অপার্থিব লোকে আমাদের উত্তরণের পথ দেখান, তাহলে তিনি কী করে পার্থিব জিনিসে সন্তুষ্ট হতে পারেন? সেই কারণে বলা হয়, আসল গুরুসেবা হল গুরুনির্দিষ্ট পথে সাধন করা।

গুরুদেব বলে দিয়েছেন, জপধ্যান, স্বাধ্যায় তথা শাস্ত্রপাঠ এবং সাধুসঙ্গ নিত্য করতে হবে। গুরু যে-নির্দেশগুলি দিয়েছেন সেগুলি মনেপ্রাণে অনুসরণ করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। 'মন চলো নিজ নিকেতনে' গানে আছে, ''সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থধাম/ শ্রান্ত হলে তথা করিয়ো বিশ্রাম/ পথভ্রান্ত হলে শুধাইয়ো পথ সে পান্থনিবাসীজনে।'' পথিকের সমস্যা এই যে, পথ চলতে চলতে কোথাও যেন তিনি আটকে যান, ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর মনে হয়, যে-পথে আমি চলছি সেটি হয়তো ঠিক হচ্ছে না, অথবা আমার চলা ঠিক হচ্ছে না। তখন গুরু আসেন এবং পথ দেখান। পথ দেখানোর অর্থ, আমাদের সাধনপথটিকে তিনি নির্দিষ্ট করে দেন।

যেকোনও সাধকের জীবনে গুরুকরণের কারণ এই, তার ফলে সাধক নিজের সাধনার স্তরকে ক্রমাগত উন্নীত করতে পারেন ধাপে ধাপে। আমরা যখন কোনও বাড়িতে উপরে উঠি, এক-একটি করে সিঁড়ির ধাপ পার হয়ে উঠি। সাধনজীবনও সেইরকম। সেখানে সাধক প্রবর্তক হয়ে শুরু করেন। ভগবান বুদ্ধ যখন সাধনজীবন শুরু করলেন তখন কত সমস্যা! ক্ষুধার তাড়না, তারপর মাররূপী

অসুর এসে হাজির হল। এইভাবে একটি-একটি ধাপ পার হয়ে তিনি বোধিলাভ করলেন। প্রতি সাধকের জীবনেই একথা সত্য। সাধককে এই প্রত্যেকটি স্তর পার হয়ে হয়ে যেতে হবে। নাহলে তিনি এগোতে পারবেন না। এখানেই গুরু তাঁকে সহযোগিতা করেন বা বিপরীত দিক থেকে বলতে পারি, এখানে গুরুর নির্দেশিত পথে চলাটি তাঁর ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। সুতরাং গুরুসেবার প্রথম ধাপ কী? গুরুর নির্দেশিত পথে চলা।

গুরুনির্দেশিত পথে চলতে গিয়ে আমরা যেন কখনও গুরুর বাক্যে সন্দেহ না করি। সেজন্যই বলা হয়েছে বিশ্বাসের কথা। গুরুনির্দিষ্ট পথে আমি চলতে পারব কখন? যখন গুরুর প্রতি আমার কুণ্ঠাহীন বিশ্বাস থাকবে। গুরু এটি বলেছেন, সুতরাং আর কোনও দ্বিধা নেই—এইরকম বিশ্বাস।

কথামৃতে শ্রীরামকৃষ্ণ বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন, ''বিভীষণ একটি পাতায় রামনাম লিখে ওই পাতাটি একটি লোকের কাপড়ের খোঁটে বেঁধে দিছল। সে লোকটি সমুদ্রের পারে যাবে। বিভীষণ তাকে বললে, 'তোমার ভয় নাই, তুমি বিশ্বাস করে জলের ওপর দিয়ে চলে যাও, কিন্তু দেখ যাই অবিশ্বাস করবে, অমনি জলে ডুবে যাবে।' লোকটি বেশ সমুদ্রের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছিল; এমন সময় তার ভারী ইচ্ছা হল যে, কাপড়ে খোঁটে কি বাঁধা আছে একবার দেখে! খুলে দেখে যে, কেবল 'রামনাম' লেখা রয়েছে! তখন সে ভাবলে, 'এ কি! শুধু রামনাম একটি লেখা রয়েছে!' যাই অবিশ্বাস, অমনি ডুবে গেল।''[২] সাধনজীবনে গুরুর বলা পথে চলা যেমন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, সেইসঙ্গে গুরুবাক্যে বিশ্বাস ও ভরসাও প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বারবার বলেছেন যে বিশ্বাস না থাকলে সে এগোতেই পারবে না। সাধন করবে কী? গুরুবাক্যে বিশ্বাস না থাকলে গুরুনির্দিষ্ট পথে এগোবে কী করে? তাই বিশ্বাস অপরিহার্য।

এই প্রথম ধাপে আমরা অনুভব করব—জীবনে যত দুর্যোগ, যত দুর্বিপাকই আসুক, দেখা যাবে এই বোধটা তৈরি হচ্ছে—জীবনে একজন কেউ আশ্রয় আছেন, যাঁর ওপর আমি নিশ্চিন্ত মনে নির্ভর করে পথ চলতে পারি। শ্রীশ্রীমার একজন শিষ্য জপ করেও মনে শান্তি পাচ্ছিল না। সে শুনেছিল, শিষ্য মন্ত্র জপ না করলে গুরুর ক্ষতি হয়, তাই মন্ত্র ফেরত দিতে চাইল। মা তাকে অনেক বুঝিয়ে শেষে বলতে বাধ্য হলেন, ''আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না।''[৩] তখন তার চৈতন্য হল। সে ভাবল—এ কী! এতদিন তো মায়ের মন্ত্রটি সঙ্গে ছিল। তার অর্থ—মন্ত্রদাতা গুরুও সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্র ফেরত নিয়ে নিলেন মানে—মন্ত্র আর তার সঙ্গে নেই, মন্ত্রদাতা গুরুও নেই! সুতরাং এই বোধটি সাধকের মধ্যে আসবে—একজন আছেন যিনি আমাকে সমস্ত বিপদে রক্ষা করছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ যতক্ষণ স্বামীজী পাননি, মায়ের অনুমতিও যতক্ষণ পাননি, ততক্ষণ তিনি পাশ্চাত্যে যাওয়ার সিদ্ধান্ত করেননি। কী গভীর নির্ভরতা!

গুরুসেবার দ্বিতীয় ধাপে সাধককে গুরুতত্ত্ব অনুধাবন করতে হয়। এটি প্রথম ধাপের সঙ্গে প্রায় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু তবুও দ্বিতীয় ধাপ বললাম এই কারণে যে, প্রথমেই তত্ত্বে তো পৌঁছনো যায় না! আমরা ছোটবেলায় যখন ভাষা শিখতে শুরু করি তখন ভাষার তত্ত্বগুলি বুঝতে পারি না। কথা বলি, পড়ি, তারপর ব্যাকরণের নিয়মগুলি, তত্ত্বগুলি জানি, অনুশীলন করি; কিন্তু তার আগেই ভাষা বলি—ঠিক বা ভুল যাই হোক— এভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হই। এক্ষেত্রেও ঠিক তাই।

গুরুতত্ত্ব মানে আমার জীবনে গুরুর স্থানটি ঠিক কোথায়? গুরু আসলে কে? শাস্ত্র বলছেন, গুরুতে মানুষবুদ্ধি করতে নেই। শ্রীভগবান বলেছিলেন অর্জুনকে : ''অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্''—যারা মূঢ় তারা আমাকে ভুল করে

মানুষ ভেবে অবজ্ঞা করে (গীতা, ৯।১১)। ভগবান এসেছেন মানুষের রূপ ধরে। শ্রীশ্রীমাকে কালীমামা যেমন বুঝতেই পারেননি, মাকে দিদি হিসেবেই ভেবেছিলেন। মাকে ধরতে পারেননি অনেকেই। ঠাকুরকেও তো কেউ কেউ বাগানের মালি ভেবেছিল। এমনকী ঠাকুরের কাছে যাঁরা আসতেন, তাঁরাও কি সবাই ঠাকুরকে বুঝতে পেরেছিলেন? ঠাকুর বলেছেন, ''অবতার অচিনে গাছ।''[৪] সহজে কি বোঝা যায় তিনি না বোঝালে? তিনি তো বোঝাবেন, আমাদেরও তাঁকে বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তাই সাধনার এই পর্যায়ে গুরুতত্ত্ব অনুধাবনের চেষ্টা দরকার। শাস্ত্র পাঠ ও আলোচনা, শাস্ত্রের সঙ্গে জীবনকে মেলানোর চেষ্টা—এগুলি অতি প্রয়োজন।

গুরু সঙ্গে সঙ্গে থেকে আমাকে নিয়ে যাবেন, উচ্চ কোনও কথা বলাবেন, আমাকে ভগবানের জন্য কাঁদাবেন—'গময়তি, উচ্চ কথয়তি, রোদয়তি'। তাহলে আমার জীবনে গুরুর অবস্থানটি কী? তিনি কি শুধু পথপ্রদর্শক? অবশ্যই তা নয়। তিনি আরও কিছু। সেটি কী? এটিই হচ্ছে গুরুতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা। নাহলে গুরুতে মানুষবুদ্ধি করে ফেলব। ভাবব প্রণাম করলে, কিছু নিয়ে গেলে গুরু বোধহয় সন্তুষ্ট হবেন। না। তিনি মন দেখেন। এটি যখন বলা হচ্ছে তখন তিনি ঈশ্বরস্বরূপ হিসেবে সাধকের অন্তরে আবির্ভূত হচ্ছেন। তাহলে এবার প্রশ্ন, গুরুর সঙ্গে ইষ্টের সম্পর্ক কী?

এটি গুরুসেবার তৃতীয় ধাপ। আবার অন্যদিক থেকে দেখলে গুরুর সঙ্গে ইষ্টের সম্পর্ক বোঝার চেষ্টাই হল গুরুতত্ত্ব বোঝার দ্বিতীয় পর্ব। প্রথম পর্ব : গুরু কে? গুরু আমার জন্য কী করছেন বা করবেন? দ্বিতীয় পর্ব : গুরু ইষ্টের সঙ্গে কোন সম্পর্কে সম্পর্কিত। সাধনতত্ত্ব বলে যে গুরু আর ইষ্ট অভিন্ন। ইষ্টশক্তি গুরুতে ক্রিয়া করে ধীরে ধীরে আমার মনকে ইষ্টে নিয়ে যায় এবং তারপর একসময় গুরু ও ইষ্ট একাকার হয়ে যান। গুরু-ইষ্টের এই অভিন্নতাবোধটি সাধনার একটি বড় ক্ষেত্র এবং এটিই গুরুসেবার সর্বোত্তম ধাপ।

সুতরাং আমরা যেন উপলব্ধি করার চেষ্টা করি যে গুরুসেবা কোনও অর্থেই কেবলমাত্র একটি বাহ্য সেবা নয়। গুরুসেবা আসলে সেবকের আন্তর সাধনা। এর সঙ্গে কি বাহ্যক্রিয়ার যোগ নেই? আছে। সেগুলিও গুরুসেবার এক-একটি গৌণ অঙ্গের মধ্যে পড়ে। এগুলি যদি তাঁর মানসপূজা হয় তাহলে গুরুসেবার বাহ্যক্ষেত্রও আর একটি রয়েছে যেটি এই মানসসেবার সঙ্গে সম্পর্কিত। সেটি কী? প্রথমত নিত্য সদ্‌গ্রন্থপাঠ। গুরু আমাকে ঈশ্বরের অভিমুখে এগিয়ে দিয়েছেন। আমাকে সেটি ধরে রাখতে হবে। এই ঈশ্বরতত্ত্ব কোথায় আছে? বিভিন্ন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে—গীতা, উপনিষদ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত, শ্রীশ্রীমায়ের কথা, স্বামীজীর রচনাবলি, পার্ষদ মহারাজদের জীবনীতে। যে-তত্ত্বে গুরু আমাদের এগিয়ে দিতে চাইছেন, যা সদ্‌বস্তু, যা আমাকে মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে যাবে, সেই বিষয়গুলি এইসব গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। তাই গুরুসেবার বাহ্য অঙ্গের একটি দিক সদ্‌গ্রন্থপাঠ। দুই, ভজনকীর্তনে, ঈশ্বরীয় কথায় অংশগ্রহণ করা। উপনিষদ বলছেন, ''অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ, অমৃতস্য এষ সেতুঃ'' (মুণ্ডক ২।২।৫)। অমৃতের সেতু কী? —অন্য কথা ছেড়ে দাও। যেকথা বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়, সেকথা ছেড়ে দাও।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে মায়ার দুটি রূপের কথা আছে—যোগমায়া আর মায়া বা জড়মায়া। জড়মায়া 'বিমুখমোহন'—ভগবানের থেকে আমাদের বিমুখ করে। যোগমায়া 'প্রমুখমোহন' অর্থাৎ ভগবানের দিকে, ভগবানের প্রমুখে আমাদের মুগ্ধ করে রাখেন। সদ্‌গ্রন্থ, ভজনকীর্তনও মায়ার সংসারের মধ্যে, কিন্তু সেগুলি ভগবানের দিকে নিয়ে যায়। ভাগবতে দেখি, ঋষিরা বসে আছেন নৈমিষারণ্যে। তাঁরা সবাই ভগবৎকথা শুনতে চাইছেন। যখন সূত

এসে উপস্থিত হলেন, তাঁরা সবাই বললেন—আপনি তো ভাগবতকথা এত সুন্দর করে বলতে পারেন, আপনি আমাদের বলুন কৃষ্ণকথা। এই যে নিত্য ভজনকীর্তন, ভগবৎপ্রসঙ্গ শোনার চেষ্টা করা বা শোনা, এটি গুরুসেবার একটি বাহ্য ক্রিয়া।

তৃতীয়—তীর্থদর্শন। যেখানে দীর্ঘদিন ধরে বহু মানুষ ভগবৎচিন্তন করেছেন, ভগবানের নামগুণকীর্তন করেছেন, সেটিই তীর্থ। তাই তীর্থে গেলে উদ্দীপন হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, তীর্থে যদি সত্যি সত্যি মনটাকে প্রস্তুত করে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে উদ্দীপন হয়। অবশ্য এটাও বলেছেন যে তীর্থে গিয়ে বিষয়চিন্তা করা খুব খারাপ। কাশী গিয়ে বিষয়চিন্তা দেখে তাঁর কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু যাঁরা সত্যসত্যই তীর্থতত্ত্ব জেনে যান, মন প্রস্তুত করে যান, তীর্থে গেলে তাঁদের ভগবৎ-উদ্দীপন হয়। মন্দিরে ঢুকলে মন আপনা থেকেই শান্ত হয়ে যায়। কেন? সেখানে অনেকে সাধনভজন প্রার্থনা করেছে, করছে। তাই মন্দিরের তন্মাত্রা পরিবর্তিত হয়ে যায়। সুতরাং তীর্থে, মন্দিরাদিতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে; দেবতাকে প্রণামের দরকার আছে। সাধারণভাবে এটি বাহ্যক্রিয়া। আর যম, নিয়ম ইত্যাদি অষ্টাঙ্গ যোগের কথা আমাদের শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। এইসবই গুরুসেবার অন্যান্য বাহ্য অঙ্গ।

গুরুসেবা আসলে সাধককে ঈশ্বর-অভিমুখে নিয়ে যায়। আমরা হয়তো গুরুর কাছে পৌঁছই অনেক কষ্ট করে, গুরুর কৃপায় মন্ত্র পাই, কিন্তু সত্য অর্থে সবাই এগোতে পারি না। কেন? তার কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—আমরা নোঙর ফেলে দাঁড় টানি। তাই হয় না।

তাই এই গুরুসেবা যদি নিত্য অনুধ্যানের চেষ্টা করি, প্রয়োগের চেষ্টা করি তাহলে বুঝতে পারব আমাদের প্রতিদিনকার জীবন পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। যে-আমি আগে ক্রোধে মোহে লোভে আসক্তিতে ভরপুর ছিলাম, পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা, দ্বেষ সবকিছুতে পূর্ণ ছিলাম, সে-আমি পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছি। যে-সংসারকে 'আমার' বলে মনে হত, সে-সংসারকে ভগবানের বলে মনে হচ্ছে। সকলের মধ্যে ঈশ্বর যেন দেখা দিচ্ছেন—এই ভাব নিয়ে আমি এগিয়ে চলেছি। গুরুসেবার এই আন্তর ও বাহ্যসাধনের পথে এগোলে সাধক ধীরে ধীরে এই প্রাপ্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠবেন। ''যত্তে কল্যাণতমং রূপং তত্তে পশ্যামি''—তোমার যে-কল্যাণতম রূপ তা আমি দেখতে চাই। আমরা যখন কারও সেবা করি তখন তাঁর প্রীতি, তাঁর তুষ্টি চাই। এই প্রীতিই আশীর্বাদ হয়ে ঝরে পড়ে আমাদের জীবনে এবং তাতেই আমরা এগিয়ে যেতে পারি।

'আশিষ্ঠ' মানুষ আসলে শক্তিমান মানুষ। ভগবৎ-আশীর্বাদ যে লাভ করেছে সে আসলে বিরল একজন; সে অনেকের মধ্য থেকে স্বতন্ত্র পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। শ্রীভগবান গীতায় অর্জুনকে বলেছিলেন, ''মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।/ যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।'' (৭।৩)—সহস্র সহস্র, কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কয়েকজন সিদ্ধিলাভের চেষ্টা করছে। যারা চেষ্টা করছে তাদের মধ্যে অল্প কয়েকজন সিদ্ধ হচ্ছে। গুরুসেবা আমাদের ওই সিদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের এই আন্তর এবং বাহ্য গুরুসেবার সুযোগ করে দেন। তাতেই আমরা ধন্য হব। আমাদের জীবন সফল ও কৃতার্থ হবে।

তথ্যসূত্র

১। দ্রঃ শ্রীম-কথিত, *শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত*, (উদ্বোধন কার্যালয় : কলকাতা, ২০০১) পৃঃ ৬৪০-৪১

২। তদেব, পৃঃ ২৬

৩। দ্রঃ স্বামী গম্ভীরানন্দ, *শ্রীমা সারদা দেবী* (উদ্বোধন কার্যালয় : ২০০১) পৃঃ ৩০৯

৪। দ্রঃ *কথামৃত*, পৃঃ ২৬০-৬১